I R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০২ বর্ষ
১১শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৯শে শ্রাবণ, ১৪২২
৫ই জুলাই ২০১৫
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

লাগাতার ভূমি লুঠে জঙ্গিপুর পৌরসভার নিকাশী ব্যবস্থা বেসামাল

নিজস্ব সংবাদদাতা : বেশ কয়েক বছর থেকেই জঙ্গিপুর পৌর এলাকায় চলছে জায়গা, পুকুর, খড়খড়ি নালা চুরির কেরামতি। পৌর প্রধান এবং পাড়ার কাউন্সিলাররা ভোটের আখের গোছাতে মদত দিচ্ছেন এই সব জুয়াচুরিতে। অননুমোদিত দেবদেবীর মন্দির আর বাড়ির সামনে দোকান বা গ্যারেজ করা বা বাথরুম-পায়খানা বা ক্লাব-ফুলবাগান করার জন্য পৌরসভার জায়গা দখল করেছে বহু বিচক্ষণ পুরবাসী। পুকুর বুজিয়ে বাড়ী তৈরী করেছে। ভূমি দপ্তরে পয়সা দিয়ে পুকুরকে ভিটিতে বদল করে নিয়েছে রাতারাতি। এক ভাটা মালিক তো খড়খড়ির গোটা উত্তরদিক গ্রাস করেছে পৌরসভার মদতে। খড়খড়ির উপর রাম সেন সেতুর বামে বিশাল জায়গা পাকা প্রাচীর দিয়ে ঘিরে একজন দখলে রেখেছে। পরে প্রাসাদ বা মল হতে পারে। পাশের এক নার্সিংহোমের লোকজন নিয়মিত বর্জ্য পদার্থ ঢেলে বুজিয়ে দিচ্ছে বাস ষ্ট্যাণ্ডের উত্তর দিকে খড়খড়িতে জল যাবার পথ। এদিকে ফল বিক্রেতারা সামনের ফুটপাত যেমন দখল করে ব্যবসা করছে, তেমনি পিছনেও তারা নয়নজুলির উপর অবৈধ নির্মাণ করে স্থায়ী সমস্যা তৈরী করে দিয়েছে নিকাশী ব্যবস্থায়। রাজ্যের দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পৌরপিতারা ধৃতরাষ্ট্রের মত শুধু দেখে গেলেন একটা শহর কিভাবে তার নিকাশী ব্যবস্থা হারাচ্ছে চিরতরে। তাই বেশী বৃষ্টি হলেই শহরে বন্যা দেখা দেয়। স্বাভাবিকভাবে উদবৃত্ত জল বার হবার প্রায় সব

(৪পাতায়)

পাঁচ বছর পর আবার বন্যা সুতীতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী-১ ব্লকের বংশবাটী, বহুতালী, হারোয়া অঞ্চলের বেশীরভাগ গ্রাম ডুবে গেছে। আহিরণ অঞ্চলের বেশ কিছুটা এলাকারও একই অবস্থা। ঝাড়খণ্ডের প্রবল বৃষ্টিতে পাগলা ও বাঁশলৈ নদীর জলস্ফীতিতে দু'সপ্তাহের ওপর এলাকায় বন্যা দেখা দিয়েছে। বটতলা, বৈষ্ণবডাঙ্গা, সিধোরী, গোপালনগর প্রায় ডুবে গেছে। সোনাপুর, পারাইপুর, লালুপুর গ্রামের যোগাযোগ চলছে ব্যক্তিগত নৌকার মাধ্যমে। কোন রকম সরকারী ত্রাণ এখনও সেখানে পৌঁছায়নি। ত্রিপলের অভাবে অনেক পরিবার ফাঁকা আকাশের নিচে। সুতী-২ ব্লকের লোকাইপুর, সাহাজাদপুর, ওমরপুর, সরলা, বসন্তপুরের একই অবস্থা। বিগত পাঁচ বছর বন্যা না হওয়ায় এলাকার চাষীরা খরা ধানের সঙ্গে আমন ধানেরও চাষ করেছিলেন। আজ সব জলের তলায়। কয়েক হাজার বিঘা জমির ধান নষ্ট হয়ে গেল। এদিকে বহুতালী, কানুপুর রাস্তার অবস্থাও সঙ্গীন। পীচ উঠে গিয়ে প্রায় রাস্তায় বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে দিয়েই চোরাই কয়লার গাড়ী যাতায়াত করছে। এ তথ্য দেন ঐ এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক আর.এস.পি নেতা জানে আলম মিঞা।

কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে

নিজস্ব সংবাদদাতা : অরঙ্গাবাদের অন্যতম বিড়ি প্রস্তুতকারক, প্রণব মুখার্জীর স্নেহধন্য ও শিক্ষানুরাগী জাকির হোসেন ১ আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জিপার্কে এক অনুষ্ঠানে কংগ্রেস থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দলের মুর্শিদাবাদ জেলার পর্যবেক্ষক শুভেন্দু অধিকারী। জাকির বলেন, ১০ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক অধ্যুষিত এই জেলায় অন্য কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। দলের নেত্রী মমতা ব্যানার্জী সুযোগ দিলে বেকারত্ব মোচনে শিল্প গড়ার ব্যবস্থা নেব। অনুষ্ঠানে এখানকার হালি নেতারা বক্তৃতার সুযোগ পেলেও মঞ্চে উপবিষ্ট সাগির হোসেন, রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, সেখ মহঃ ফুরকান ব্রাত্য থেকে যান। সভায় উপস্থিত কয়েক হাজার দর্শকের মধ্যে অনেকের সেটা চোখে লাগে।

পদ্মার জলে মানুষের লাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের বাহুরা ঘাট ও তার আশপাশ দিয়ে পদ্মার জলে ভেসে যাওয়া একাধিক মানুষের মৃতদেহ এলাকার লোকেদের নজরে আসে। খবর পেয়ে মৃতদেহগুলো বিএস এফের জওয়ানরা উদ্ধার করে নিয়ে যায়। স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, গরুর দলকে সাঁতরে নদী পার করার সময় অনেক রাখাল বি.এস.এফের গুলিতে মারা যায়। ভেসে যাওয়া মৃতদেহগুলো ঐ সব রাখালদের। তাই মৃতদেহ উদ্ধারে বি.এস.এফের এই তৎপরতা।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে
হোটেল ইন্ডিগো
(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), ফোন-০৩৪৮৩/ ২৬৬০২৩
সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাশ্মিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৪২২

আধি যখন ব্যাধি

শরীর থাকিলে শরীরে বাধি বা বালাই আসিতে পারে। আপ্ত বাক্য বলে--শরীর ব্যাধির মন্দির। তাই শরীরকে আগে প্রাধান্য দিতে হয়। শরীর ভাঙিলে সব কিছুই ভাঙিয়া দিবে। কথায় বলে সুস্থ শরীরে থাকে সুস্থ মন। কিন্তু এই বিপন্ন ভাঙা সময়ে মানুষের মন কতটা সুস্থ আর কতটা স্বাভাবিক তাহা লইয়া বিচার বিতর্কের তুফান উঠিতেই পারে। জীবনানন্দীয় ভাষায় পৃথিবীর এখন গভীর অসুখ চারিদিকে শুধু অস্পষ্ঠতা। স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মনের উপর তাহার প্রভাব বা চাপ আসিয়া পড়িতেছে অহরহ।

মানুষের জীবনে সাম্প্রতিক এ্যহস্পর্শ-ফীভার-ফ্রেট-ফ্রাসটেশন। মানুষের দেহে এবং মনে তাহার এখন তখন নানা চাপ--চাপের পারদ নিয়তই ওঠানামা করিতেছে। শরীর সুস্থ থাকিলেও মনের অসুস্থতা নানা দিকে বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহার ফলে অন্তর্ঘাতী কালান্তক এক অসুখের করাল গ্রাসে পড়িতেছে মন এবং শরীর। মনের অসুখ বাধাইতেছে শরীরের অসুখ রোগ বালাই ব্যাধি ব্যারাম---এই সব সমার্থক শব্দ সংকট। যুগের জ্বর, হতাশা, ডিপ্রেশন এই বিপন্ন সময় কালের ব্যাধির উদ্ভেদক, বলা ভাল জনক।

রক্তে মাত্রাতিরিক্ত শর্করা এই রকম এক অন্তর্ঘাতী ব্যাধি। প্রতিনিয়ত উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা নাকি এই ব্যাধির জননকারী। এই সবের চাপ মনের উপর ক্রমাগত পড়ার ফলে শরীরের উপরে তাহার প্রভাব আসিয়া পড়ে। সাধারণতঃ বুদ্ধিজীবী মানুষদের মধ্যে এই ব্যাধির প্রকোপ দেখা যায়। ব্যাধির বোধ হয় বাছ বিচার নাই। যাহাদের মন আছে তাহাদের চিন্তা দুশ্চিন্তা আছে।

রক্তে শর্করা বা ডায়াবেটিস এখন পৃথিবীর সর্বত্র। এই রোগ বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা আনার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১৪ই নভেম্বরকে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস হিসাবে পালনের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। নজির হিসাবে এক সমীক্ষামূলক গবেষণা চালাইয়াছে ওড়িশার কটক ডায়াবেটিস গবেষণা সংস্থা। একটি দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনে দেখা যায়--১৯৯৯ সালে অক্টোবরে ওড়িশার সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী অঞ্চল সুপার সাইক্লোন বা মহা ঘুর্ণিঝড়ে সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত বা বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাণ-সম্পত্তি-রাজ্যের অর্থনীতিও চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ইহার স্মৃতি এখনও ঐ অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে প্রতিনিয়ত তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ--তাহাদের মানসিক দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগ ভুক্তভোগীদের রক্তের শর্করার মাত্রা বাড়িয়াই চলিয়াছে। তাহারা অনেকেই নাকি আজ ডায়াবেটিসের শিকার। আরো জানা যায়---মহাঝড়ের পূর্বে ডায়াবেটিক রোগীর সংখ্যা ছিল আড়াই লক্ষের মতো। এখন তাহার সংখ্যা পনের লক্ষের মতো।

রক্তে শর্করাক্রান্ত রোগী শুধু এই রাজ্যেই নয়, সর্বত্রই বহু মানুষ এই ব্যাধির মৃগয়া। উদ্বেগ, দুশ্চিন্তাই যদি এই ব্যাধির হেতু হয় তবে তাহার কবল হইতে অব্যাহতি কিভাবে সম্ভব ? মানুষের সচেতনতা বাড়িলেই কি উদ্বেগের পারদ নামিয়া আসিবে ? কে জানে ? সংকটের বিহ্বলতায় এখন অনেকেই ম্রিয়মান।

বন্‌ধ

মীনাক্ষী রায়

স্ট্রাইক ! স্ট্রাইক ! দোকানে কপাট, দপ্তরে চাবি ট্রামে বাসে চাকা বন্ধ। --সুভাষ মুখোপাধ্যায়

--স্ট্রাইক বা ধর্মঘট প্রতিবাদের এক প্রাচীনতম অস্ত্র। একে স্বতঃস্ফূর্তও বলা যেতে পারে। মন থেকে আপনা আপনি এই স্বতঃস্পূর্ত প্রতিবাদ বেরিয়ে আসে। সামগ্রিকভাবে এই প্রতিবাদগুলোকে এক করেই তৈরী হয় প্রতিবাদী আন্দোলন--সামগ্রিক ধর্মঘট বা হরতাল।

শিশুর প্রথম প্রতিবাদ--খাব না। অর্থাৎ অনশন ধর্মঘট। পরবর্তীকালে এই অনশনের আরও বৃহত্তর রূপ আমরা দেখতে পাই যতীন দাসের ক্ষেত্রে যা আত্মদানে পরিণত হয়েছিল। ধর্মঘটের আসল চেহারা কাজ বন্ধ। শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্র ধর্মঘট, কলকারখানার ক্ষেত্রে শ্রমিক ধর্মঘট, মজদুর ধর্মঘট, যানবাহনের ক্ষেত্রে চাকা বন্‌ধ অর্থাৎ যান অচল। এক বা একাধিক ইস্যুর ভিত্তিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্মঘট ডাকা হয়। ইস্যুটি যখন সমাজের বৃহত্তর অংশের সমর্থনযোগ্য তখন ডাকা হয় প্রদেশ বা দেশ জুড়ে ধর্মঘট। যেমন বাংলা বন্‌ধ বা ভারত বন্‌ধ। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বন্‌ধ ডাকেন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি শাসকদলের বিরুদ্ধে। শাসকদল স্বাভাবিকভাবেই বন্‌ধের বিরোধিতা করে থাকে। পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধি, বাস ভাড়া বৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি সংবেদনশীল ইস্যুর উপর সাধারণত বন্‌ধ ডাকা হয়। রাজনৈতিক দলগুলি এই ধরনের কর্মসূচীকে ভিত্তি করে দলকে সংহত করেন, নিজেদের শক্তির পরিমাপ করেন এবং তাঁরা যে জনসাধারণের পাশে আছেন তা বোঝানোর চেষ্টা করেন। অন্যদিকে বন্‌ধে শ্রম দিবস নষ্ট হয়, স্কুল কলেজে পঠন-পাঠনের ক্ষতি হয় এবং দরিদ্র মানুষের রুজি রোজগার সম্পূর্ণভাবে ব্যাহৃত হয়। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মুখ্যমন্ত্রীত্বের আমলে বিরোধী দলগুলি টানা আটচল্লিশ ঘণ্টার হরতাল ডেকেছিলেন। তখন বিরোধী দলনেতা ছিলেন জ্যোতি বসু। সেই হরতালের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে রিক্সাওয়ালা, হকার, ছোট দোকানদার প্রভৃতিরা মিছিল করে এসে জ্যোতি বসুর বাড়ী ঘেরাও করেন এবং শ্লোগান দেন--

বন্‌ধের ডাক ফিরিয়ে নাও,
খেয়ে পরে বাঁচতে দাও।
দিন আনি দিন খাই
বাংলা বন্‌ধে উপোস পাই।' ইত্যাদি

কিছু চাকুরীজীবি বন্‌ধে ছুটি উপভোগ করলেও অধিকাংশ লোকই কোনও না কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। ঘন ঘন বন্‌ধ কোনও অর্থেই কাম্য নয়। কারণ সংবেদনশীল ইস্যু হলেও মানুষ বার বার ক্ষতিগ্রস্ত হতে চান না। অসঙ্গত বন্‌ধ পরীক্ষা দিয়ে ফেল করার মত দলের দুর্বলতাটাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। দলীয় সমর্থকরা উদ্দীপনার পরিবর্তে হতাশায় ভুগতে থাকেন। বন্‌ধ ডাকার আগে রাজনৈতিক দলগুলির সব দিক ভালোভাবে খতিয়ে দেখা উচিত।

লাইব্রেরীর সার্থকতা

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

আজকাল এমন একটা জায়গা দেখা যায় না যেখানে দু'একটা লাইব্রেরী না আছে। লাইব্রেরীর উৎসাহী বালক ও যুবকদের বলতে শোনা যায় যে, লাইব্রেরী স্থাপন করলে নাকি দেশের শিক্ষা সমস্যার একটা সমাধান করা যায় এবং তাঁরা সেই সদুদ্দেশ্য নিয়েই এই শুভকার্য্যে নেমে যান। বাস্তবিক, প্রকৃত লাইব্রেরী স্থাপনের উদ্দেশ্য যে তা'ই, তা'তে আর সন্দেহ নাই।

লাইব্রেরী স্থাপনের উদ্দেশ্য এই যে, তা'তে এমন সব বই ও পুঁথি রাখা হ'বে, যার দ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত থাকবে। বর্তমানে লাইব্রেরীর সঙ্গে যাঁদেরই সম্বন্ধ আছে, তাঁদের এটা পরিষ্কার জানা দরকার যে পাঠকদের প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের উদ্দেশ্য সকলের উপরেই লাইব্রেরীর সার্থকতা নির্ভর করে। কেবল অবসর বিনোদনের পাঠ্য সরবরাহের জন্যই লাইব্রেরী স্থাপন নয়। লাইব্রেরীর মহান উপকারিতা সম্বন্ধে একটা খুব উচ্চ ধারণা প্রত্যেক পাঠকেরই বিশেষভাবে থাকা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার সাহায্য করাও লাইব্রেরীর একটি প্রধান কাজ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা লাইব্রেরী হবে অধিকতর জ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র।

আজকাল আমরা দেশের চারিদিকে যত লাইব্রেরী দেখতে পাই, তাতে যদি এই সব উদ্দেশ্য বাস্তবিক রক্ষিত হয়, তা'হলে ব'লতে হ'বে আমরা শিক্ষা ও জ্ঞান সম্বন্ধে উন্নতির পথে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি তাই ? পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমরা লাইব্রেরী স্থাপন করি, আর মনে মনে প্রচুর আত্মপ্রসাদ লাভ করি যে, আমরা শিক্ষার উন্নতির সাহায্য করছি।

দেখ্‌তে পাচ্ছি, অলিতে গলিতে লাইব্রেরী স্থাপন করে আমরা উপন্যাস ও গল্পের বই-এর পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি করছি। আজকাল আর সেকাল নয় যে, কষ্ট ক'রে নূতন বই এর পাতা কেটে নিতে হবে। তবু যদি দপ্তরীর অসাবধানতায় কোন মাসিক পত্রের পাতা কাটা না থাকে, তা'হলে দেখা যায় সে সেগুলি ৫/৭ জনের পড়া হয়ে গেলেও গল্প উপন্যাসের পাতাগুলি ছাড়া অন্য পাতা কাটাই হয় না। তারপর চলছে আরও একটা ভয়ঙ্কর জিনিস। আর্টের নাম ক'রে যে সব নক্কারজনক গল্প ও উপন্যাস আজকাল বাজারে বা'র হচ্ছে, সেগুলো পড়লে লজ্জায় মাথা হেঁট করতে হয়। অথচ সে সব হ'ল আজকালকার অনেকেরই পাঠ্য।

সকলেরই নিজে কিছু পয়সা খরচ ক'রে বই কিনবার সামর্থ্য নেই, কিন্তু পড়বার সখ আছে। কাজেই মাসে দু'চার আনা খরচ করে লাইব্রেরীর সভ্য হয়ে তাঁরা এই সব বই পড়ছেন। তার ফল হচ্ছে এই যে, এই সব হালকা সাহিত্য ও রোমাঞ্চকর গল্প ও উপন্যাস পড়ার পর কোন গভীর বিষয়ে মনঃসংযোগ করবার ক্ষমতা একেবারে লোপ হয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষা আমাদের ক্রমেই পল্লবগ্রাহী হয়ে পড়ছে। গভীর বিষয়ের গবেষণার সাহায্য করাই লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত একথা আগেই বলেছি। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হলে লাইব্রেরী থেকে আধুনিক কুরুচিসঙ্গত গল্পের বই ও উপন্যাস একেবারেই বাদ দেওয়া উচিত।

দেশের বর্তমান দুর্দ্দিনে যুবকদের অনেক কিছু করবার আছে, তার মধ্যে লাইব্রেরীর সংস্কারে প্রয়োজনও আছে। (রচনাকাল ১৩৩৬)

ভরা শ্রাবণে

শীলভদ্র সান্যাল

ভূতভাবনবাবু বাজার যাবেন বলে লুঙ্গির ওপর ফতুয়াটা চাপাতেই আবার সেই চেপে বৃষ্টি এল। আকাশের দিকে কটমট করে চাইলেন ভূতভাবন। নাঃ ! এ-মেঘ চট ক'রে কাটবে ব'লে তো মনে হয়না। আকাশ যেন আরও কালো হ'য়ে এল। নিচ থেকে কাবেরীর তীক্ষ্ণ গলা, 'শুনছ ! আজ আর বাজার গিয়ে কাজ নেই। ফ্রিজে যা আছে তাই দিয়েই এ-বেলা হয়ে যাবে। শুধু হারানের দোকান থেকে ক'পিস ডিম আনিয়ে নেব'। ভূতভবন মনে মনে হাসলেন। তাই আবার হয় নাকি ! মালদা থেকে আজই মেয়ে জামাই আসছে। সঙ্গে তো বুবুনও আছে। মাংস খেতে কত ভালবাসে। তাছাড়া উকিল মানুষ ভূতভাবন। তাঁর একটা প্রেস্টিজ আছে না ! চটি ফট ফট ক'রে রাস্তায় নামতেই বিপত্তি ! জল-কাদায় সে এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। এখানে-ওখানে খানা-খন্দ-গর্তবুজে চতুর্দিক জল থৈ-থৈ ! মাঝে বৃষ্টিটা একটু ধরেছিল। আবার সেই টিপ-টিপ, টিপ-টিপ। ভূতভাবন ছাতাটা ফোটাতেই পাশ দিয়ে একটা মোটরবাইক একগাদা জল-কাদা ছিটিয়ে চ'লে গেল। তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ প্রয়োগ করার আগেই বাইক নাগালের বাইরে। ভূতভাবনের মেজাজটা খিচরে গেল। শ্রাবণের মেঘ আর মিউনিসিপ্যালিটি--দুইয়েরই ওপর। এ যেন চুকলো ভোট। সবাই ফোট। গদি-লাভই পরম সিদ্ধি। তারপর আঙ্গুল ফুলে কলা বৃদ্ধি। তখন আর কেউ কাউকে চেনে না। না হলে শহরটার এমন হাল-হকিকৎ হয় ! ব্যাঙে মূত্রত্যাগ করলেও রাস্তায় জল জমে যায়। আর বলিহারি বাপু ওই শ্রাবণের মেঘ ! ছাড়বার নামটি নেই। অথচ জুনের মাঝামাঝি হাঁসফাঁস গরমে অতিষ্ঠ হয়ে তার-ই জন্যে তখন কত হা-পিত্যেশ। আল্লাহ ! ম্যাঘ দে, পানি দে ক'রে চাষি ভাইদের মাথা কোটা। দশটা সাড়ে দশটা বাজতেই মাথা-খারাপ করা রোদ্দুরে সব পালাই-পালাই। রাস্তাঘাট শুনশান। আবহাওয়া অফিসের মুণ্ডপাত। তবু কোথায় সেই একটুকরো মেঘের সজল-স্নিগ্ধ মায়া! তোমার দেখা নাইরে-- তোমার দেখা নাই। একে গরম তায় লোডশেডিং--দুইয়ের জোড়াফলায় প্রাণ-ওষ্ঠাগত। আর এখন ? সেই মেঘের ফ্যাস্তাকলে প'ড়ে প্রাণ খাবি খায়। ঠেকায় প'ড়ে এটাই ফের মালুম যে, সূয্যিঠাকুরের কৃপা ভিন্ন গতি নেই। ভেতর থেকে কে যেন বললো, ক'দিন বৃষ্টিতেই এমন তেতরে গেলে হয় নাকি। যাওনা কেরল। যাও মধ্যপ্রদেশ। যাও অসম। সেখানে তো সব বন্যায় ভাসছে। আর বন্যা মানেই বন্যাত্রাণ। মানেই পলিটিকস। আর পলিটিকস্ মানেই পকেট ভারি। থাকগে এ-সব নিয়ে আমার কচলানোর দরকারটা কী বাপু ! আমি কিনা উকিল মানুষ। ঘরে-ঘরে যত হামলা। ততই মকোদ্দমা-মামলা। গায়ে চড়াও সামলা। আর বাদী-বিবাদী দু'পক্ষ সামনে

(শেষাংশ ৪পাতায়)

দাদাঠাকুর ও নজরুল

মানিক চট্টোপাধ্যায়

কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে দাদাঠাকুরের এক মধুর সম্পর্ক ছিল। নজরুল দাদাঠাকুরকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর 'চন্দ্রবিন্দু' গ্রন্থখানি তিনি এই শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ দাদঠাকুরকে উৎসর্গ করেছেন। দাদাঠাকুরও নজরুলকে নিজের ভাইয়ের মত ভালোবাসতেন। 'তুই' বলে সম্বোধন করতেন। দাদাঠাকুরের একটি রচনায় লক্ষ্য করি সেই সখ্যতার কথা। 'ভুলে ভুলে ঘুরে ঘুরে আছে বেশ রগড়ে/ দেখি ইসলাম ভায়াও বাঁধলো বাসা বরাহনগরে।'

দাদাঠাকুরের সঙ্গে নজরুলের মিল অনেক জায়গায়। নজরুল ইসলামের বাল্যকাল থেকে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই। কিন্তু দারিদ্র্য তাঁর কাব্যসাধনায় কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারেনি। তাঁর কিশোরজীবন ছিল বাঁধনহারা দামাল ছেলের মত। দাদাঠাকুরও শৈশবকাল থেকে কৃচ্ছ্র সাধনার মধ্য দিয়ে বড় হয়েছেন। সংসারের অভাব-অনটন তাঁকে দমাতে পারেনি। সব কিছু সম্ভব হয়েছিল পিতৃব্য রসিকলালের কঠোর অনুশাসনে। নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী কবি। জনগণের কবি। অত্যাচারিত শোষিত সাধারণ মানুষের নীরব বেদনার সার্থক রূপকার। জীবনে যাকে সত্য বলে জেনেছেন, তাকে তিনি প্রকাশ করেছেন অকুণ্ঠ দৃপ্তভঙ্গীতে। দাদাঠাকুরও সারাজীবন নির্যাতিত শোষিত মানুষের হয়ে কথা বলেছেন। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'– এই মন্ত্র তিনি সারা জীবন জপ করে গেছেন। মানবিকতাই তাঁর সমগ্রজীবনব্যাপী সাধনা। একদিকে তিনি যেমন দুঃখীর দুঃখ মোচনে অগ্রসর হয়েছেন, অক্লান্ত পরিশ্রমে আর্তের সেবা করেছেন, অপরদিকে তেমনি অকুতোভয়ে দণ্ডায়মান হয়েছেন দুষ্টের দমনে। মুখোশ খুলে স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়েছেন স্বার্থান্বেষী ভণ্ড ব্যক্তিদের।' দাদাঠাকুরের বিভিন্ন প্রবন্ধে-সাংবাদিকতায়-কবিতা ও গানে তাঁর এই বিদ্রোহী ভূমিকা বার বার মানুষের সামনে প্রকাশিত হয়েছে।

নজরুল দাদাঠাকুরের সঙ্গে এক পারিবারিক সম্পর্কে বাঁধা পড়েছিলেন। একটি ঘটনার কথা বলি। দাদাঠাকুরের দৌহিত্র ইন্দুমতী দেবীর বড় ছেলে অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এটা জেনেছি। রন্ধন শিল্পে ইন্দুমতীদেবীর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। বলা বাহুল্য এই পারদর্শিতা তিনি অর্জন করেছিলেন তাঁর মা প্রভাবতীদেবীর কাছ থেকে। একদিন কাজিসাহেব দাদাঠাকুরের কোলকাতার বাগমারীর বাসায় এসেছেন। প্রভাবতী দেবীও এসেছেন তাঁর চিকিৎসার জন্য। রান্নাবান্নার কাছে সাহায্য করার জন্য সঙ্গে নিয়ে এসেছেন বড় কন্যা ইন্দুকে। মুসুর ডাল রান্না হচ্ছে। তার কী সুঘ্রাণ ! নজরুল তো বলেই ফেললেন : 'হ্যাঁ রে ইন্দু, কী রান্না চাপিয়েছিস্। চারদিকে কী মিষ্টি সুবাস। দাদাঠাকুর বললেন--'তাহলে দুপুরে খেয়ে যা। তখনই

(শেষাংশ ৪পাতায়)

কবির আরও কাজ

হরিলাল দাস

ভাষা কোবিদ কবির গদ্যচর্চা।। সশ্রম নিষ্ঠায় বাংলা ভাষা নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন এবং সাহিত্যে তার প্রয়োগ করেছেন রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যের সোকর্য সাধন করে।

আমরা যে ভাষায় কথা বলি সেই আটপৌরে গদ্য এখন সাহিত্য অঙ্গনে ব্রাত্য নয়। কিন্তু আগে তা ছিল না। সেকালে ভাব আদান-প্রদান বা প্রবন্ধ রচনায় গদ্য ভাষার ছিল আলাদা চেহারা। কখন কিভাবে এসব পরিবর্তন হয়েছে, তার ইতিহাস আছে। "বিদ্যালয়পাঠ্য বইয়ের কথা বাদ দিলেও একথা মনে রাখতে হবে যে, সংবাদপত্র বস্তুটা আমাদের দেশে সম্পূর্ণ নতুন হলেও গদ্য অবলম্বনেই সে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং আমাদের প্রাত্যহিক চিন্তাভাবনা কৌতূহল অনুসন্ধিৎসা এবং তার নিবৃত্তি এই সংবাদ পত্রের সৌকর্যহীন প্রয়োজন সাধনের গদ্য দিয়েই রূপ নিয়েছিল।"--ভবতোষ দত্ত এই বিচার করেছেন তাঁর 'বাংলা গদ্য ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে। আর রবীন্দ্রনাথ সেই 'নিতান্তই খবরের কাগজি ছাঁদের' গদ্যকে রূপান্তরিত আদল দিয়ে সুষমামণ্ডিত বাংলা গদ্য বরণ করেছেন সাহিত্যসংসারে।

"আমি বোধ করি, কবিতার হ্রস্বে পদ, ভাবের নিয়মিত ছেদ ও ছন্দ এবং মিলের ঝংকার বশত কথাগুলি অতি শীঘ্র মনে অঙ্কিত হইয়া যায় এবং শ্রোতাগণ তাহা সত্বর ধারণা করিতে পারে। কিন্তু ছন্দোবন্ধহীন বৃহৎকায় গদ্যের প্রত্যেক পদটি এবং প্রত্যেক অংশটি পরস্পরের সহিত যোজনা করিয়া যাইতে বিশেষ একটা চেষ্টার আবশ্যক করে।" ১৩০১ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ কবিতা আর গদ্যের পার্থক্য এবং কাজ নির্ণয় করে এ বিষয়ে লিখেছেন তাঁর 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য'-তে।

আর গদ্যকে কীভাবে বিদ্যাসাগরী গদ্যে ব্যবহার করেছেন তার দিকচিহ্ন নির্দেশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর 'বিদ্যাসাগর চরিত' (১৩০২) রচনায়। "গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনি সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।"

রবীন্দ্র গদ্যচর্চার নানা দিকের দিশা দিতে উদ্ধৃতিগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। অভিনিবেশ সহ পাঠ করলে সংক্ষেপে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে। এই ভাবে ফোর্ট উইলিয়ম শিক্ষালয় (১৮০১ সালে স্থাপিত) হতে বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১), বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪) হয়ে বীরবল (১৮৬৮-১৯৪৬) এবং "সবুজপত্রে" (১৯১৪) এসে এই গদ্যালোচনার আপাত বিরতি।

রবীন্দ্রনাথের বাংলা গদ্য পরিক্রমা এক শিক্ষাণীয় ও আনন্দজনক বিষয়। এর আস্বাদন সম্পূর্ণতা পাবে রবীন্দ্র গদ্যসাহিত্য পাঠে। তার অবকাশ আমাদের বাঙালি জীবনে নেমে আসুক।

ভরা শ্রাবণ.....(৩ পাতার পর)

ভূতভাবনের কপাল আরও চওড়া। সামনের বাদল অধিবেশনে বড়রকম ঝড় বাদলের আশঙ্কা। চার কন্যার চতুস্পর্শে দামোদরজি মৌনীবাবা। তার ওপর ব্যপম-কাণ্ড জমি অধিগ্রহণ বিল। গ্রহশান্তির জন্য বাবাজি কী নির্দেশ দেন এখন সেটাই দেখার। বার-এ্যাসোসিয়েসনের সেক্রেটারি ভূতভাবন। ওকালতির বাইরেও কত কিছু ভাবতে হয় ষাট ছুই-ছুঁই উকিলবাবুকে।

--ভূতো ! এই ভূতো ! এই বৃষ্টিতে চললি কোথায়। চমকে পাশ ফিরে দেখেন পাঁচকড়ি পোদ্দার। জানলার ফাঁকে ইয়া মোটা সেই পরিচিত গোঁফ জোড়া। হাতের মুদ্রায় বিশেষ ইঙ্গিত পেয়ে নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না রসিক ভূতভাবন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাল্যবন্ধু পাঁচকড়ির বাড়িতে মদ্যপানের আসর বসে। তাই বলে আজ এই সকালে ? ঘরে ঢুকেই বললেন, কিরে ! এই ভরা শ্রাবণে নতুন কোনও ভাবের উদয় হল নাকি ! কিছু লিখলি-টিখলি ? পাঁচকড়ি এখন বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত কবি। গোটা পনের কাব্যগ্রন্থের মালিক। সম্প্রতি 'আনন্দ পুরস্কার'-এ সম্মানিত। আবার শান্তিনিকেতনের ভিজিটিং প্রফেসর। তবে, নামটা মোটেই কবি সুলভ নয় বলে 'রূপচাঁদ পক্ষী'--ছদ্মনামে লেখেন। অবশ্য এ তল্লাটে সবাই তাঁকে 'পাঁচুদা' বলেই জানে। হেসে বললেন আরে ! সেই জন্যই তো তোকে ডাকা ! কি আইডিয়াল পরিবেশ বলতো। পাঠও হবে, পানও হবে। বলেই গেলাসে খানিকটা ঢেলে এগিয়ে দিলেন বন্ধুর দিকে। নিজেও নিলেন। বলা বাহুল্য ভূতভাবন মোটেই কবিতা শোনার পাত্র নন। তবু আগ্রহী-শ্রোতার ভান করতে হয়, তা শুধু এই পানের টানেই। পাঁচকড়িও তার যোগ্য ইনাম দেন গেলাস ভর্তি করে। আর কেনা জানে কবিরা তাদের কবিতা শোনাবার জন্য আসন্ন প্রসবার মত ছটফট করে। গরু খোঁজার মত ক'রে, গলায় গামছা লটকে ধরে আনে অনিচ্ছুক শ্রোতা। সেদিক দিয়ে ভূতভাবন অনেক সুলভ বস্তু। নেশা জমে উঠতেই পাঁচকড়ি বার করলেন তাঁর সদ্য লেখা কবিতা : ও মেঘ ! তোর কাজল-কালো চোখে/জল-ছল-ছল কিসের এমন মায়া ! / আজ শ্রাবণে কার অ-কারণ শোকে / আকাশ-জোড়া ধূসর-করুণ ছায়া/ কুণ্ডলিনী ! আজ দেখি তোর একী রূপের ঢল / কৃষ্ণকালি ! দেনা আমায় এক-আঁজলা জল !' ভূতো ওরফে ভূতভাবনও তখন নেশার ঘোরে গুণগুনিয়ে উঠল, 'আমি নীল শাড়িতে দেখেছি যে নীল যমুনার ছল '! ঠিক এমনই সময়ে রসভঙ্গ ক'রে মোবাইলের রিংটোনটা মুখর হ'য়ে উঠল। ও প্রান্তে কাবেরীর উদ্বিগ্ন গলা, 'কি গো। বাজারে গিয়ে গিয়ে ফেরার নামটি নেই। কোথায় জমেছ ? তোমার মাংস আনার কী হল ? এদিকে মনুরা কতক্ষণ এসে গেছে !

ভূতভাবন লাফ দিয়ে উঠলেন। তাইতো ! মাংসের কথা একদম খেয়াল ছিলনা ! এস্‌স্‌ ! মেয়ে-জামাইয়ের সামনে আজ যে লজ্জায় মাথা কাটা গেল।।

লাগাতার ভূমি.....(১ পাতার পর)

রাস্তা বন্ধ। তাই সম্প্রতি কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে ডুবে যায় ফিল্ড কলোনী, লালি বিস্কুটের পিছনের পল্লী, গোয়ালপাড়া, মসজিদপাড়া ইত্যাদি ইত্যাদি এলাকা। তড়িঘড়ি মহকুমা শাসক, পৌর ভাইস চেয়ারম্যান লোকজন নিয়ে এসে বিক্ষোভ সামলান। মহকুমা শাসক সব দপ্তরের অফিসারদের নিয়ে নিকাশী ব্যবস্থার স্থায়ী প্রতিকারের আশ্বাস দেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছু হয়নি। দেড় দিনের বৃষ্টিতে রঘুনাথগঞ্জ শহর এলাকার কয়েকটি ওয়ার্ডের যা হাল দেখা গেল, তাতে নিকাশী ব্যবস্থার কোন উন্নতি না হলে ১৫,১৬,১৭,১৮,১৯,২০ ওয়ার্ডের মানুষেল দুর্গতি পুনরায় দেখা দেবে। এর মধ্যে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিপন্ন মানুষ কাউন্সিলারকে নিয়ে একটা আলোচনায় বসেন। হিউম পাইপ ভেঙে দিয়ে নিকাশী ব্যবস্থা চালু করার কথা আলোচনায় উঠে আসে এই পর্যন্ত। প্রতিবছর নিকাশী পরিষেবা ও রাস্তা মেরামতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ দেখিয়েছে পৌরসভা। কিন্তু নিট যোগফল কি ? ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত--ফুলতলা এলাকার ১৯-২০ এবং এদিকে ১৭,১৮,১৫,১৬, ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের জলনিকাশীর প্রধান নালাগুলো দখলমুক্ত না করলে ভয়াবহ 'ম্যান মেড' বন্যায় অযথা ডুবতে হবে পৌরবাসীদের। তখন রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে না বলে রেহাই পাবে না পৌর কর্তৃপক্ষ। এ প্রসঙ্গে ভাইস চেয়ারম্যান সুবীর রায় জানান-- নয়নজুলির ওপর যে সব অবৈধ কনস্ট্রাকশন আছে সেগুলো ভেঙে দিয়ে নিকাশী ব্যবস্থাকে সক্রিয় করার সিদ্ধান্ত নেয় বর্তমান পুরবোর্ড। বোর্ড অব কাউন্সিলারদের সিদ্ধান্তের কপি মহকুমা শাসককে দেয়া হয়েছে। মহকুমা শাসক জরুরী ভিত্তিতে এর ব্যবস্থা নেবেন বলে পৌর প্রতিনিধিদের জানিয়েছেন।

দাদাঠাকুর.....(৩ পাতার পর)

বুঝবি রান্নার কী স্বাদ।' নজরুল খুব তৃপ্তি করে সেদিন দুপুরের খাওয়া সারলেন দাদাঠাকুরের বাসায়।

শরৎ বসুর বাড়িতে দাদাঠাকুর--নজরুল এঁদের অবাধ গতিবিধি ছিল। একদিন নজরুল বলেই ফেললেন শরৎ বসুর স্ত্রীকে-- 'আপনাদের উড়িয়া ঠাকুরের রান্না, আর আমার এই দাদার মেয়ে ইন্দুর রান্না--দুটোর আসমান জমিন ফারাক। এই হল নজরুল। দাদাঠাকুরের পারিবারিক জীবনে পরতে পরতে জড়িয়ে পড়া। নজরুল আমাদের মহকুমার জগতাই (নিমতিতা) গ্রামে এসেছিলেন। এখানেই যোগীরাজ বরদাচরণের সাক্ষাৎলাভ। তারপর অনেকবার লালগোলায়। দাদাঠাকুরের রঘুনাথগঞ্জের বাড়িতে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সে প্রসঙ্গে দাদাঠাকুরের সহাস্য মন্তব্য : 'আমার ব্রাহ্মণী খুবই কড়া। কোলকাতার মত তোকে সেখানে আমার পাশে খেতে দেবেনা। এটা দেখে আমি বড় কষ্ট পাব ভাই।' নজরুলের তাৎক্ষণিক উত্তর : 'আমি বাড়ির উঠানে একধারে বসে খাব। আমার উচ্ছিষ্ট আমিই জল দিয়ে ধুয়ে দেব।' জানিনা দাদাঠাকুর এটা মন থেকে সমর্থন করেছিলেন কিনা ! তবে সে যুগে দাদাঠাকুর ছিলেন সমস্ত জাত-পাতের উর্দ্ধে। এটা দাদাঠাকুরের নজরুলের সঙ্গে এক সহজ সরল হাস্যালাপ। এটা জেনেছি দাদাঠাকুরের পৌত্র অনুত্তমের কাছ থেকে। অনুত্তমের কাছ থেকে আর একটি মজার ঘটনা জেনেছি। দাদাঠাকুর তখন কোলকাতার কোন এক আসরে। সে সময় তাঁর বড় পুত্র বিনয়কুমার পণ্ডিত টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন। টেলিগ্রাম পুত্র সন্তান হবার সংবাদ। দাদাঠাকুর উপস্থিত সকলকে বললেন ঃ 'আমার আর এ আসরে থাকা হবেনা। রঘুনাথগঞ্জে রওনা হতে হবে। বিনয় টেলিগ্রাম করে জানিয়েছে তার পুত্র সন্তান হয়েছে।' নজরুল বললেন--'দাদা আমি আপনার নাতির নাম রাখব।' নজরুলকে দাদাঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন--'তুই নেড়ে, কী আর নাম রাখবি ?' নজরুল বললেন--'আমি নাতির নাম রাখলাম অরিন্দম। যদি এই নাম কারো পছন্দ না হয় তবে বাদ দেবেন।' বাড়ীর সকলেরই নজরুলের রাখা নামটি পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। 'অরিন্দম' নজরুল প্রদত্ত নাম। যায় হোক নজরুলের শরীর সুস্থ থাকলে তিনি একদিন না একদিন ঠিকই দাদার রঘুনাথগঞ্জের বাড়িতে আসতেন। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। কারণ মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতে হারিয়ে ফেলেছিলেন স্বাভাবিক কর্মশক্তি। তাঁর স্মৃতিশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি 'ফুলের জলসায়, এক নীরব কবি। সুন্দর ফুল--সুন্দর ফল'--আর আল্লার দেওয়া পানির দুনিয়া ছেড়ে তিনি চলে গেলেন এক অন্য জনতে। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগষ্ট। আর দাদাঠাকুর তাঁর নজরুল ভায়ার আরও আগে। ১৯৬৮ সালের ২৮ এপ্রিল।

জঙ্গিপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।
জঙ্গীপুর গিনি হাউস
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
আমরা ক্রয়ের উপর ক্রেডিট কার্ড ও ডেবিট কার্ড গ্রহণ করি
গহনা ক্রয়ের উপর ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।